(এবং পঞ্চায়েতও যেহেতু একটা সরকার তাই সেখানকার) কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং কী কাজ হচ্ছে সেব্যাপারে প্রতিনিয়ত নজরদারির ব্যবস্থা।

তৃতীয়ত, অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ। যদিও কথাটি বিতর্কিত। তবুও, বিতর্ক বাদ দিয়ে এই কথাটির অর্থ দাঁড়ায়, গ্রামীণ মানুষের হাতে তাদের নিজেদের উন্নয়ন এবং এর জন্য নীতি, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া রচনা এবং তা প্রয়োগের চূড়ান্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতার হস্তান্তর। অর্থাৎ এই মানুষেরা নিজেদের উন্নয়নের জন্য, ভালর জন্য, উন্নয়নে পরিকল্পনা রচনা তার রূপায়ণ এবং মূল্যায়ন করবে। এ বিষয়ে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে এ রাজ্যের ছয়টি এবং বর্তমানে ১২ টি জেলায় মোট ৮১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ চলছে। এই কর্মসূচির মূল দু'টি লক্ষ্য, রাজ্যস্তরে বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে বিভিন্ন কৌশল ও নীতি প্রণয়নে সহায়তা করা, এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করা।

উপরে উল্লিখিত কথাগুলি ও তার ফলশ্রুতিতে যেসব কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে সেগুলি একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার জন্যই বেশিরভাগ কাজ করা হচ্ছে। শুধু ইদানিংকালে নয়, ৩০ বছর ধরে নিরন্তর এই প্রক্রিয়া চলছে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হওয়ার পর কী হল? পঞ্চায়েত কি নিরপেক্ষ হল? তাতে মানুষের অংশগ্রহণ কি বাড়ল? পঞ্চায়েতের কাজে স্বচ্ছতা এল? পঞ্চায়েত কি দায়বদ্ধ হল, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সংবেদনশীল হতে পারল?

উত্তরটি খুঁজতে হলে সুশাসন কথাটি আমাদের একটু খতিয়ে দেখা দরকার। সুশাসন কথাটি ছোট হলেও বহুমাত্রিক। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সংবেদনশীলতা, নিরপেক্ষতা এবং অংশগ্রহণের মতো শব্দগুলি। সম্প্রতি 'স্ব-শাসন ও সুশাসন' নামক একটি তথ্যচিত্রে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী এবং প্রধান সচিব সুশাসনের ধারণার কথা বিশদে বলার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলেছেন, পঞ্চায়েতে সুশাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। যে প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করতে চাইছি তা হল, সুশাসন ব্যবস্থা পঞ্চায়েতে চালু করতে হবে বললে বোঝা যায়, যে সে ব্যবস্থা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সার্বিকভাবে নেই। যদি তাই হয়, তবে তো পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখনও স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সংবেদনশীলতা, নিরপেক্ষতা আসেনি। অর্থাৎ সুশাসনের এই মূল শর্তগুলি যদি না থাকে, তবে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ, সহভাগী পরিকল্পনা, জন-অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলি কেবল কথার কথা হয়েই রয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রথমত গ্রাম সংসদ, যেখানে বছরে দু'টি সভা হয়, সেই সভায় ভোটারদের উপস্থিতির হার ইদানিং তুলনামূলকভাবে সামান্য বাড়লেও, সংসদগুলিতে মোটের উপর উপস্থিতির হার বেশ হতাশাজনক। অথচ ওই একই সংসদে ভোটের সময় গড়ে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ ভোট দিচ্ছে। এ ঘটনায় দু'টি বিপরীত চিত্র ধরা পড়ে। যা প্রমাণ করে কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর দিকে খুব একটা নজর নেই।

দ্বিতীয়ত, তথ্যের অধিকার আইনে নির্দেশিত প্রায় সব কাজই নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করেছিল রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর। এর মধ্যে একটি বড় বিষয় হল, বিভিন্ন তথ্যের স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা, যা জন-কর্তৃপক্ষ হিসেবে আইনটি লাগু হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে করার কথা। এই ঘোষণার অনুসারী একটি ছক রাজ্য দফতর থেকে করে পাঠালেও, কোনও পঞ্চায়েতই এই ঘোষণা এখনও অবধি করেনি। অর্থাৎ মানুষকে জানানোর যে প্রক্রিয়া, তা অর্জন করা গেল না। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, পঞ্চায়েত বিষয়টি জানে না। কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানকে ৩০ বছর ধরে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চললেও, তারা এখনও সময়মতো প্রয়োজনীয় তথ্যই জানতে পারছে না, সেটা বললে শক্তিশালী করার প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে যায়। আসলে অনেক কথা আলোচনা হলেও, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি বাস্তবে